আমাদের ঘুঘু পাখী

পুরানো ঢাকায় এক সময় প্রচুর জ্বালালী কবুতর দেখা যেত । পুরানো বড় বড় দালানের বিভিন্ন কোনায় ওদের বাস । আমরা দল বেঁধে ছুটির দিনে এয়ারগান আর গুলতি নিয়ে বেড়িয়ে পড়তাম । লক্ষ্য একটাই -কবুতর শিকার করা । কবুতরগুলোও ভীষন বোকা । একবার গুলি মারলে একটা মারা যেত - আর বাকী সব উড়ে গেলেও, ঠিক পাঁচ মিনিট পর আবার ঐ একই জায়গায় এসে দিব্যি বসে পড়ত । আমরা তো এটাই চাইতাম । এক, দুই, তিন করে ডজন খানি শিকার হলে তবেই ক্ষান্ত দিতাম । ইচ্ছে করলে আরো শিকার করা যেত- কিন্তু পরের সপ্তাহের জন্য বাকী কবুতর গুলো লক্ষ্য করতাম । শুধু কি কবুতর? বন্ধুদের মধ্যে রীতিমত বাজী হোত কে চড়ুই আর কাক মারতে পারবে? চড়ুই আর কাক কবুতরের মত বোকা নয় । অত সহজে ওগুলো শিকার করা যায় না । কিন্তু আমাদের থামায় কে?

স্কুলের ছুটিতে গ্রামে মামার বাড়ী গিয়ে লম্বা সময় থাকা ছিল সবচেয়ে মজার । কারন ওখানে বক, হাস, কবুতর, ঘুঘু পাখী ছাড়াও টুনটুনি পাখী পাওয়া যায় । আর যেহেতু টুনটুনি খুব ছটফট করে - তাই ওটাকে মারার কৃতিত্ব এক ডজন বক মারার চেয়েও অনেক আনন্দের ।

গ্রামের এক ছেলে আমার মত শহরের ছেলেকে শেখালো ঘুঘু মারার ফন্দি । দুই হাতের মুঠো এক ক'রে তাতে কায়দা করে ফুঁ দিয়ে আমি দিব্যি ঘুঘু'র ডাক দেয়া শিখে গেলাম । কোন জঙ্গলে গিয়ে একটানা এই ভাবে ঘুঘু'র ডাক দিতাম । আর তখন সত্যি সত্যি ঘুঘু পাখী এসে গাছে বসত । ব্যস...আমাকে আর আটকায় কে? সেই সকালে এয়ার গান আর গুলতি নিয়ে বেড়িয়ে যেতাম -ফিরতাম বিকেলে । হাতে তখন কত রকমের শিকার করা পাখী । আমার দিদিমা কড়া মশলা দিয়ে রান্না করতো । কিন্তু রাতে খেতে দিলে খেতে পারতাম না । দিদিমা অবাক হয়ে বলতো- 'কি ওইলো- এত না শখ কইরা মারলি -অহন খাশ না ক্যা?'

গ্রামে থাকা অবস্থায় শিখলাম একা কি ভাবে মুরগী কাটা যায় । ঢাকা শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ও বাড়ীর মুরগী কাটার দায়িত্বটা ছিল আমার । একনাগাড়ে চার পাঁচটা মুরগী কেটে বড় এলুমিনিয়ামের বোলের নিচে ছেড়ে দিতাম । গলাকাটা মুরগীগুলো বেশী ছটফট করলে ঐ বোলের উপর পা দিয়ে বোলটা চেপে রাখতাম যতক্ষন না মুরগী গুলোর ছটফটানী শেষ হয় । এক হাতে ছুড়ি, অন্যহাতে রক্ত, পায়ের নীচে ছটফট করা মুরগী- নিজেকে বেশ বীর নায়কই মনে হোত ।

কোরবানীর সময় দল বেধে গরু জবাই দেখতে যেতাম । ঈদের পর স্কুল খুললে বন্ধুদের সাথে পাল্লা দিয়ে গল্প হোত কে কত ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছে, কে কয়টা জবাই দেখেছে? যার বিবরণ যত ভয়াবহ সে তত বীর হিসাবেই চিহ্নিত হোত । আমি নিখুঁত ভাবে বর্ণনা দিতাম কি ভাবে পাড়ার দুজন বড় ভাই খালি হাতে একটা বিশাল গরুকে ধপাস করে ফেলে দিল । গরু উঠে গেল- এবার চারজন ধরলো, দ্রুত দড়ি দিয়ে পা বেঁধে ফেললো । কিন্তু না..তাতেও গরুকে জব্দ করা গেল না । আরো চারজন গরুর উপর বসে চেপে ধরলো । ইমাম সাহেব বিশাল একটা ছুড়ি দিয়ে যেইনা গলায় পোঁচ দিল- সেই বিশাল গরু এক ঝাপটায় মানুষগুলোকে গা থেকে ফেলে দিল । আমার বর্ণনা শুনে বন্ধুদের হাত পা ঘামতে শুরু করে...সবার চোখে মুখে একই প্রশ্ন, 'তারপর কি হোল? তোর ভয় লাগেনি'? আমি বীরের মত বর্ণনা শেষ করতাম, 'একটুও না । আমি ভয় পাবো কেন? তারপর সেই ইমাম সাহেব যেই না ছুড়ির পোঁচ দিয়েছে- ফিনকি দিয়ে রক্ত গিয়ে পড়লো পাড়ার সেই সাহসী বড় ভাইয়ের গায়ে । সারা গা সেকেন্ডের মধ্যে লাল হয়ে গ্যাল । যারা ঐ গরুকে শক্ত করে ধরে রেখেছিল- তারা ভয় পেয়ে গরু ছেড়ে দিল । কাটা গলা নিয়ে গরু প্রায় অর্ধেক উঠে গেলে । এবার আরো চারজন গরুকে জাপটে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিল । ইমাম খুব দ্রুত জবাই করে ফেলল । আর সেই সাহসী বড় ভাইটি রক্ত মাখা পাঞ্জাবী গায়ে লাগিয়ে সারা পাড়ায় আরো দশটি কোরবানী দিল । বাড়ীর বৌ ,মেয়েরা আদর করে তাকে সেমাই খাওয়ালো আর সেই গল্প শুনলো ।

এমনি একটি পরিবেশের পুরানো ঢাকায় আমি বেড়ে উঠেছি । তাই কবুতর, ঘুঘু, বক দেখলে মনে পড়ে এয়ার গানের কথা । হাতের আঙ্গুলগুলো কেমন যেন নেচে উঠে । গ্রামে বেড়াতে গিয়ে কারো বাড়িতে বড় মুরগী দেখলে আগ বাড়িয়ে বলতাম -'মুরগী কাটার মানুষ দরকার হইলে আমারে ডাইকেন । আমি একহাতে মুরগী কাটতে পারি । মুরগীর রানটা খাইতে কিন্তু দারুন লাগবো ।' কোন নাদুস নুদুস গরু দেখলে হিসাব কষতাম গরুর গায়ে কত মাংস হবে? রানটা কত ভারী হবে? সহজ সরল সমীকরনে -পশু-পাখীদের আমি কেবলই দেখেছি খাবারের অংশ হিসাবে । ওদের জন্ম হয়েছে শ্রেফ আমাদের প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর জন্য । গরুকে কখনই আমার 'মহেশ' মনে হয়নি ।

বিদেশীদের পশু প্রেম ঐ টেলিভিশনেই দেখেছি । তখন দেখতাম আর ভাবতাম পাগল কাকে বলে । কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় এসে ঐ প্রেম যখন

চোখের সামনে দেখতাম তখন বিরক্ত লাগলে ও চুপ করে থাকতাম। নিজেকে নিজেই বলতাম- ফুটানীর কত রং ! ঠিক এমন একটি ফুটানীর ঘটনা ঘটলো সিডনীতে যখন আমাদের বয়স সাতদিন। ঋভুর বয়স তখন ছয়। আমরা তিনজন রাস্তা দিয়ে হাটছি। আমাদের সামনে ১০-২৫ বছরের সাদা অষ্ট্রেলিয়ান দুজন ছেলেমেয়ে গলাগলি ধরে, চুমু খেতে খেতে হাটছিল। এমন দৃশ্য দেখে অভ্যস্থ নই। তাই ঋভুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি হেটে ওদের ক্রস করে যেতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু ছেলে আমার কিছুতেই হাটবে না। হঠাৎ দেখলাম ছেলে মেয়ে দুজন একটা গাছের সামনে দাড়ালো। তারপর মাটি থেকে পরম যত্নে প্রায় তিন ইঞ্চি সমান একটা ফড়িং তুলে গাছের ডালে বসিয়ে দিল। কাছে এসে দেখলাম- ফড়িংটার একটা ডানা ভেঙ্গে গেছে। আমরা তিনজন অনেকক্ষন ওদের দুজনের চলে যাওয়ার পথে তাকিয়ে রইলাম। কিছুতেই বুঝলাম না কি কারনে ফড়িংটাকে বাচাঁনোর প্রয়োজন হোল? ঘটনাটি ঋভুও দেখল। তারপর একশ প্রশ্ন। ফড়িংটার কি হয়েছে? ওর বাসা কোথায়? বাসায় বাচ্চা আছে কিনা। সেই ঋভু যখন বড় হয়ে উঠলো- সে বাড়ীতে আমাদের পিপড়া মারতে দিত না। ওর যুক্তি একটাই, 'ঐ পিপড়া তো তোমাকে কিছু করছে না- তাহলে মারবে কেন?' ইঁদুর ধরার কলে একবার ছোট একটা ইঁদুর পড়লো। ঋভুর কারনে ওটাকে না মেরে অনেক দূরে নিয়ে ছেড়ে দিতে হোল। কতক্ষন গজ গজ করলাম আর ভাবলাম এটা ওর ফুটানী!

সিডনীর দরিদ্র কিছু কমিউনিটির সাথে আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি। ওদের অবস্থা আমাদের ঐ বস্তিবাসীদের মত। শুধু তফাৎটা এই যে সরকার ওদের ভাতা , থাকার একটা সুন্দর বাড়ী দেয়। আর ওরা ইংরেজীতে কথা বলে। কিন্তু ঝগড়া-ঝাটি আর গালাগালিতে বস্তির মানুষকেও হার মানাবে। আমরা সপ্তাহের দু-রাতে ঐ এলাকার তরুন-তরুণীদের বিনামূল্যে খাবার দিতাম। আমার কিছু বয়স্ক ভলেন্টিয়ার ছিল যারা ঐ ভাতা পেত। প্রায়ই অতিরিক্ত খাবার ওদের দিয়ে দিতাম। এক সন্ধ্যায় এক ভলেন্টিয়ার আমার কাছে এসে কাচুমাচু করে বললো-

- আমাকে কিছু খাবার দিতে পারো? আমার কাছে কোন ডলার নেই।

আমি দেখলাম ওর হাতে কিছু সপিং ব্যাগ এবং সেখানে কিছু খাবারের প্যাকেট। আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম-

- আজকে তো তোমাদের ভাতা পাওয়ার দিন। টাকা পাওনি?

- হ্যা পেয়েছি। সব বিল দিয়ে যা বাকী ছিল তা দিয়ে আমার বিড়ালের জন্য খাবার কিনেছি।

আমি বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বলে কি ? এটা কি রকম ফুটানী?

আমার বিস্মিত হবার পালার আরো কিছু বাকী ছিল। কারমেল আমার সহকর্মী। প্রায়ই ওর ছেলের গল্প করে। ছেলেকে প্রি স্কুলে দিয়েছে। ওরা দুজনই চাকরী করে। অফিস শেষ করে ওরা স্কুল থেকে ছেলেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তারপর পার্কে ঘুরতে যায়- নতুবা ছেলের জন্য সপিং করে। খুব সুখী সম্পতি। যখনই দেখা হয় আমি গভীর আগ্রহে ওদের ছেলের কথা জিজ্ঞেস করি। কারমেলও ভীষন খুশী হয়ে গর গর করে সব গল্প বলে। একদিন বললাম-

- তোমার ছেলের ছবি নেই?

- অবশ্যই আছে। আমার অফিসে আসো।

আমি ওর সাথে ওর টেবিলে গেলাম। দেখলাম কম্পিউটারের স্ক্রীন জুড়ে একটা বড় ছবি। করমেল উচ্ছাস নিয়ে বলল-

- আমার ছেলেটা দারুন কিউট না?

আমি মুখ ফসকে বলতে যাচ্ছিলাম- 'কোথায় তোমার ছেলের ছবি?' কিন্তু কম্পিউটারের স্ক্রীনে তাকিয়ে বুঝলাম ওটাই ওর ছেলের ছবি। আমার বর্ণনায় ওটা একটা কুকুরের ছবি।

আমি ওর অফিস থেকে বের হয়ে পাচঁ মিনিট কারো সাথে কথা বলতে পারিনি।

ঠিক একই ধাক্কা খেয়েছি- যখন এ্যানি - যে ভীষন ধনী এবং ২ মিলিয়ন ডলারের একটি ফার্ম কিনে ওখানে ছুটির দিনে তার 'বেবীসদের' সাথে থাকে। সারা জীবন টাকার পিছনে ছুটেছে -তাই বাচ্চা নেয়ার সময় হয়নি। এখন দুটা ছাগল আর চারটা মুরগী ওর সন্তান !

শুধু কি বিদেশীদের ফুটানী দেখেছি? উহু..এবার একজন বাঙ্গালীর কথা বলি। এখানে অনেক বাঙালীর ঘরে বিড়াল, কুকুর আছে। আমি এক পরিবারকে চিনি যাদের ঘরে 'মিমি' ঘুরে বেড়াচ্ছে গত ১৩ বছর ধরে। মিমি ওদের বিড়ালের নাম। সেই পরিবারের ছোট ছেলের বয়স ১১। মানে ঐ বিড়াল সেই ছোট ছেলের চেয়ে বেশীদিন আদর পেয়েছে! বিড়ালও পরিবারের উপাধি ব্যবহার করে। ডাক্তারখানায় গেলে ডাক পড়ে - 'মিমি রহমান এখন ডাক্তার তোমায় দেখবে।'

আমি বুঝি না। সত্যি আমি এই সম্পর্কের স্পন্দন কি জানি না। আমি পুরানো ঢাকায় বড় হয়েছি। রাস্তায় কুকুর, বিড়াল অনাদরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। কারনে -অকারনে ঐ পশুগুলোকে ঢিল, লাথি, খোঁচা দিতাম। এটাই ছিল নিয়ম। পশুর প্রতি ভালোবাসাটা কেমন- কখনও বোঝার

চেষ্টা করিনি । পশুকে কিভাবে ভালোবাসে -তাও জানি না । পাখী দেখলে হাতের আঙ্গুলগুলো নিশপিশ করে, গরু দেখলে মাংসের হিসাব করি । আর কুকুর, বিড়াল হোল -ঢিল মেরে হাতের নিশানা ঠিক করার পশু । ওদের জন্য ভালোবাসা কিসের?

মৌসুমী যখন গর্ভবতী তখন আমাদের ব্যাকইয়ার্ডের গাজীবুটা কামিনী গাছের ভাড়ে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়লো । গাছটি মৌসুমীই লাগিয়েছিল । ভাবলাম গাছটা কেটে ফেলি । শ্বাশুড়ীর কাছ থেকে হুকুম এলো যে এই সময় গাছ কাটতে নেই । বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে । আমি ভাবলাম তাহলে গাছটি দড়ি দিয়ে বেঁধে দেই । ঠিক তখনই দেখলাম গাছের মধ্যে একটি ঘুঘু পাখী বাসা বেঁধে ডিম পেড়েছে । মৌসুমী কড়া নির্দেশ দিল যেন ঐ ঘুঘু পাখীকে বিরক্ত না করি । আমি খুব যত্ন করে গাছটি বেঁধে দিলাম যেন ঘুঘু পাখীর বাসা না পড়ে যায় । কি আশ্চর্য ! ঘুঘু পাখীর বাসাটি আমার হাতের নাগালের মধ্যে, হাত বাড়ালেই পাখীটি ধরতে পারি । কিন্তু গাছটি ঠিক করার সময়- ঘুঘু পাখীটি উড়ে গ্যালো না । চুপ করে বসে ডিমে তা দিচ্ছিল ।

কয়েক সপ্তাহ পর দেখলাম ঘুঘু পাখীটি নেই । গাছের নিচে ডিমের খোসা পড়ে আছে । মৌসুমী তখন হাসপাতালে । আমাদের ঘরে তখন ঋষিতা এসেছে । ঋষিতাকে নিয়ে বাড়ী এলাম । আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত ওকে ঘিরে কেটে গ্যালো । আমি অবাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি । ওর চুল, চোখ, ঠোট, ছোট ছোট আঙ্গুলগুলো স্পর্শ করি আর ভাবি এই অপূর্ব সৃষ্টি, শিল্প আমি কিসের সাথে তুলনা করবো? দিনভর আমি কেবল ওর হাতের, গায়ের গন্ধ শুঁকি । আহ..কি পবিত্র ! ঋষিতা যেদিন চোখ খুলে ধীরে ধীরে ওর ভাষায় আমাদের সাথে কথা বলা শুরু করলো -আমার আনন্দে চোখে জল চলে এলো । আমি নিজেও জানতাম না এই ছোট্ট মানুষটির জন্য আমার ভিতর এতো ভালোবাসা জমে ছিল । আমি এখন কারনে-অকারনে ঋষিতার উপর ভালোবাসার কামান দাগাই । ওকে আদর করে কত নামে ডাকি । তারপরও মনে হয়- ঠিকভাবে আমার ভালোবাসার আর আদরের কথাটি বলা হোল না । মৌসুমী তখন বলে-

-শোন, ও হচ্ছে আমাদের ঘুঘু পাখী । ঐ যে আমাদের গাছে বাসা বেঁধে ডিম পেড়েছিল । গাছটি ভেঙ্গে পড়েছিল- কিন্তু তুমি পরম যত্নে ওদের বাসাটা ঠিক করেছিলে । সেদিন থেকেই ওরা জানে আমরা ওদের কে হই? বাচ্চাটা তাই ডিম থেকে বেড়িয়ে সোজা আমাদের ঘরে চলে এসেছে ।'

আমি এক ভিন্ন ধ্যানে মগ্ন হই । ঋষিতার চেহারাটা যেন ঠিক ঘুঘু পাখীর মত মনে হয় । আমি দুই হাতের মুঠো এক করে ফুঁ দিয়ে ঘুঘু পাখীর ডাক দেই । ঋষিতা খিলখিল করে হেসে উঠে । আমার জন্য এ এক আশ্চর্যক্ষণ । আমি মুহূর্তেই ফিরে যাই সেই শৈশবে । আমি দুই হাতের মুঠো এক করে আরো জোড়ে ফুঁ দেই । আর বনের সব ঘুঘু পাখী ঋষিতার মত খিলখিল করে হেসে উঠে ।

আমার ঘরের এই ঘুঘু পাখীর জন্য আমার প্রতিটি লোমকূপে যে আদর আর ভালোবাসা জমে আছে -ঠিক একইভাবে কারমেল, এ্যানি, আর ঐ বাঙালী পরিবারের হৃদয়ে ভালোবাসা জমে আছে ওদের প্রিয় পশু-পাখীগুলোর জন্য । মানুষ এবং পশুর এই ভালোবাসার সম্পর্কটা বুঝতে আমার এতদিন লাগলো?

জন মার্টিন

অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক

probashimartins@gmail.com